গুরুদেবের তিরোধান মুহূর্তে

ওঁ গুরু কৃপা হি কেবলম্

পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমাধবানন্দ গিরি মহারাজ তাঁর মানবলীলার অন্তিমলগ্নে আমাকে তাঁর সন্নিকটে আকর্ষণ করেছিলেন এবং তাঁরই কৃপায় তাঁর পার্থিব তিরোধানের মুহূর্ত্তগুলি আমার মানসপট থেকে যথাসাধ্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। এ কাজে আমার কোন ভুল ত্রুটি থাকলে, তারজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

* * *

১৩৮০ সনের ১৪ই পৌষ (৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩) সকালে কোন্নগর আশ্রমে যথারীতি গুরুপ্রণামের শেষে আমার ঐ তারিখেই বারাণসী যাত্রার জন্য বাবার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। শুভ আশীর্বাদ প্রদানের পর বাবা আমাকে বললেন, "আমি এবার কুম্ভ মহাযজ্ঞে হরিদ্বার যাব।" মহোৎসাহে আমি বললাম, "বাবা, আপনার সংগে আমিও যাব।" শুনে বাবা বললেন, "খুব ভাল, আমি ত এই-ই চাই।" (বাবার সন্তানেরা তাঁর সংগে যাক্, এটা বাবা বরাবর পছন্দ করতেন)। বাবার আশীর্বাদ পাথেয় করে আমি ঐদিন সন্ধ্যায় বারাণসী যাত্রা করলাম।

* * *

শিবধাম বারাণসীতে বেশ কিছুদিন থাকার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই এবং স্ত্রীকে ও বলি, "দেখো, চাঁদসী-দা ব্যানার্জী-দা, সান্যালদি দেখা হলেই অনুরোধ জানান যে, বেনারসে এলে এত কাছে তাঁদের বাড়ী লক্ষ্ণৌ যেন যাই। বিশেষ করে চাঁদসীদার অভিযোগ যে, তিনি কোন্নগর এলে বাবার আদেশে আমাদের রিষড়ার বাড়ীতে থাকেন, অথচ আমি তাঁর লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে কেন যাই না? তাই চল, আমরা সপরিবারে আগামীকাল সকালে পাঞ্জাবমেল যোগে লক্ষ্ণৌ চলে যাই।" স্ত্রীও এ ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়ায় পরদিন ২৪ শে জানুয়ারী লক্ষ্ণৌ যাত্রার উদ্দেশ্যে বারাণসী ষ্টেশন রওনা হই। যথা সময়ে ট্রেন এলে আমরা চেপে বসলাম এবং কয়েকঘণ্টা যাত্রার পর বিকেল সাড়ে চারটার সময় লক্ষ্ণৌ এসে পৌছাই। এখানে ট্রেনে চড়ার যাত্রী সংখ্যা এত বেশী ছিল, যে তাদের ওঠার ব্যস্ততাহেতু আমরা অতিকষ্টে ভিড় ঠেলে কোন ক্রমে প্লাটফর্মে নেমে দেখি যে, ভিড়ের চাপে আমার স্ত্রীর গায়ে পশমের চাদর নেই। মেয়ের পায়ে জুতা নেই। এমন কি বেডিংটা তখনও নামানো বাকী। ইত্যবসরে ট্রেন ছেড়ে পুনরায় চলা শুরু করে দিয়েছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ভিতরের যাত্রীরা জানালার ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে বেডিংটা প্লাটফর্মে ফেলে দিয়েছিল। লক্ষ্ণৌ আসার প্রাথমিক পর্বে মনটা খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে প্রিয় গুরুভাই বোনদের সংগে আসন্ন মিলনের কথা স্মরণে মনটা বেশ

উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্লাটফর্মের বাইরে এসে রিক্সাভাড়া করলাম এবং সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ চাঁদসী-দার বাড়ীতে পৌঁছলাম।

*　　*　　*

চাঁদসী-দার স্ত্রী দরজা খুলে বাড়ীর ভিতর আসার জন্য সাদর আহ্বান জানালেন। তাঁর মুখেই শুনলাম যে, চাঁদসী-দা বাড়ী নেই। কোলকাতায় মেয়ের বাড়ী গেছেন। এরপর তিনি আরও একটা খবর দিলেন যে, বাবা (গুরুমহারাজ) সেদিন-ই 'কাহারা' থেকে লক্ষ্ণৌ এসেছেন। বাবা কোথায় অবস্থান করছেন জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন যে, তিনি মহানগরে ব্যানার্জি-দার বাড়ীতে আছেন। গুরু-ভাইবোনদের সংগে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ এসে বাবার দর্শন, অমৃতবাণী শ্রবণ করবার অভাবনীয় সৌভাগ্যে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। সে রাত্রে না গিয়ে পরদিন সকালেই বাবার কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিই। কিছু সময় পর চাঁদসী-দার স্ত্রী আমাদের জলখাবার দিলেন। জল-খাবারের পর নানাবিষয়ে আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। এদিকে আমার মনে আশঙ্কা হলো যে, বাবা যখন জানতে পারবেন যে, বাবার এত কাছে থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর কাছে গেলাম না, এখানে থাকলাম, তখন নিশ্চয়ই তিনি আমার ওপর ভীষণ রাগ করবেন। যাই হোক্ রাত ১০ টা নাগাদ রাতের খাওয়া শেষ হল। চাঁদসী-দার স্ত্রী দোতলার একটা ঘর আমাদের শোবার জন্য খুলে দিলেন, আমরাও সেখানে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। এদিকে কোন এক অজানা আশঙ্কায় আমার চোখে ঘুম আসছে না। পরদিন সকালে বাবার কাছে গেলে তিনি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করবেন। বলবেন,—"এই তোর গুরুভক্তি! আমি রইলাম এখানে আর তুই এত কাছে এসেও আমার কাছে থাকলি না?" সারাক্ষণ এই ভয় আমার মন জুড়েছিল। এইরকম চিন্তার মধ্যে কোন সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চাঁদসী-দার স্ত্রীর ডাকে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলাম যে, বাবার শরীর সাংঘাতিকভাবে খারাপ হয়েছে। অজুদা আর জিতেনদা ডাক্তার ডাকতে চাঁদসী-দার বাড়ীতে ফোন করতে এসে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন এবং আমি সেখানে আছি জেনে আমাকে বাবার খবর জানাতে বলেছেন। তখন রাত্রি ১২টা। ঘরের বাইরে এসে অজুদার কাছে শুনলাম যে, সে রাতে শরীর খারাপ হওয়াতে বাবা বটুদার মাকে তৎক্ষণাৎ তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। বটুদার মা গুরুদেবকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। অজুদা ও জিতেনদা চাঁদসী-দার বাড়ী ফোনে ডাক্তারকে 'কল' দেবার জন্য এসেছেন। অজুদা আমাকে বললেন, "নেপালদা, তুমি যাবে?" আমি সংগে সংগে বললাম, "যাব।" অজুদা ও জিতেনদার সংগে মোটরবাইক ছিল। আমি পিছনের সীটে চেপে বসলাম। ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী ও উঠে পড়েছিল, সমস্ত শুনেছিল। যাবার সময় তাকে বললাম, "তুমি চাঁদসী-দার স্ত্রীর সংগে এস।" দুচিন্তা নিয়ে শীঘ্রই আমরা বটুদার বাড়ীতে বাবার কাছে এসে পৌঁছলাম। সেখানে সুহাষদাকে বাবার সেবায় রত দেখলাম। তিনি গুরুদেবকে বললেন, "বাবা, নেপালদা এসেছে।" আমি ও সংগে সংগে বললাম, "বাবা, আমি এসেছি, আপনি কেমন আছেন?" বাবা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভাল থাক।" আমি গুরুদেবকে বললাম, "বাবা, আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে আপনাকে কোন্নগরে নিয়ে যাব।" বাবা

হাত নেড়ে বললেন, "না।" আমি বাবার মাথার গোড়ায় বসে সেবা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাদে চাঁদসীদার স্ত্রী সঙ্গে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা উপস্থিত হল। বাবার অসুস্থতায় সকলেরই মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। এদিকে ডাক্তারের নিষেধ ছিল যে, গুরুদেবের কাছে যেন বেশী লোক না থাকে। এই কারণে আমরা সারারাত্রি বাবার ঘরের বাইরে বসে থাকলাম। ভোরবেলায় বাবা সুহাষদাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ডাঃ প্রণব কি এসেছে?" সুহাষদা উত্তর দেন, "না"।

২৪শে, রাত কেটে যাবার পরদিন ২৫শে জানুয়ারী সকাল থেকে বাবার অবস্থার ক্রম অবনতি ঘটতে লাগল। তাঁর কথা আস্তে আস্তে বন্ধ হতে থাকল। আমি সর্বক্ষণই গুরুদেবের চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চাঁদসী-দার বাড়ী গেলাম। ভাত খাবার পর বাবার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হলাম। চাঁদসী-দার বাড়ীর টেলিফোন মাধ্যমে কোলকাতার গুরুভায়েদের কাছে গুরুদেবের অসুস্থার খবর দিতে থাকলাম। মুকুলদা, প্রণবদা; তুষ্টুদা, অমিয়দা, সতীনাথদা সবাইকে একে একে খবর দেওয়া হল। রাত প্রায় ১০-৩০ মিঃ আমি আবার বটুদার বাড়ী এলাম। তখন থেকে আমি, বটুদার মা, জিতেনদা বাবার ঘরের ভিতর ছিলাম। অন্য একটা ঘরে সুহাষদা ও অজুদা সাময়িক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এদিকে রাত্রি যত বেশী হতে থাকল, বাবার শরীরে এক অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা গেল এবং ক্রমশঃই সেটা বাড়তে লাগল। তিনি কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রাম করে তাঁর গুরুদেব ও পরম গুরুদেবের স্মরণ নিতে থাকলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে অঝোরে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। সভয়ে আমি তাঁর মুখে সরাপাত্র ধরতে থাকলাম এবং বটুদার মাকে সেটা দিতে লাগলাম। তিনি ঐ পাত্রের রক্ত একটা গামলায় ফেলতে থাকলেন এবং আঁচল দিয়ে বাবার মুখ মোছাতে ব্যস্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেজর দেব ও মেজর সিংকে খবর পাঠিয়ে সত্বর ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করা হল। এইভাবে প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমার তখন কেবলই মনে হতে লাগল যে, আমাদের মত অধম সন্তানদের রক্ষাকল্পে সমস্ত অকর্ম ও কুকর্মজনিত পাপের বিষ গুরুদেব স্বয়ং পান করেছিলেন। ব্রহ্মলোকে যাবার প্রাক্‌মুহূর্তে যেন সেইসব গরল রক্তধারারূপে উদ্গীরণ করেছিলেন। কিছু সময় পরে মেজর দেব-দা এসে পড়লেন। ডাক্তারও এসে গেলেন। ডাক্তারের পরামর্শে আমরা সবাই বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরীক্ষান্তে ডাক্তার নির্দেশ দিলেন যে, গুরুদেবের সেবার জন্য তিনি দু'জন নার্স পাঠাচ্ছেন। তারা ছাড়া বাবার কাছে যেন আর কেউ না থাকে। রাত ১২-৩০ মিঃ সময় দুজন নার্স বাবার সেবার দায়িত্বে তাঁর ঘরে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি চাঁদসীদার বাড়ী চলে গেলাম।

* * *

সেদিন ২৬ জানুয়ারী, রাত্রি আনুমানিক ১-৩০ মিঃ খবর এল যে, গুরুদেবের ইহজীবনের অন্তিমলগ্ন সমাগত প্রায়। যথা সম্ভব শিষ্য-ভক্তদের খবর দেওয়ার ব্যবস্থা হোল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সহ আমি ও চাঁদসীদার বাড়ীর সকলে বাবার কাছে চলে এলাম। তখন রাত্রি দুটো। দেখি যে বাবা অচৈতন্য অবস্থায় শায়িত আর সেই নার্স দুটি বাবার বুকে যথাসাধ্য 'ম্যাসেজ' করে চলেছে। যাতে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। কিছুক্ষণের মধ্যে গুরুদেবের গলার ভেতর থেকে এক

অস্বাভাবিক 'ঘড় ঘড়' শব্দ বার হবার সঙ্গে সঙ্গে পরমপূজ্য গুরুদেব মানবলীলা সংবরণ করে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন।

গুরুদেবের তিরোধানের খবর সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতা বাসীদের টেলিগ্রাম মারফৎ জানাবার ব্যবস্থা হল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত ও শিষ্যরা দলে দলে শেষ দর্শনের জন্য আসতে শুরু করল। এ সময় গুরুদেবের সমাধিস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে উপস্থিত শিষ্যবর্গ দ্বিমত পোষণ করায় সমস্যা দেখা দিল। অনেকে কোলকাতার শিষ্যদের মতামতের অপেক্ষায় থাকার পরামর্শ দিলেন। অজুদা সুহাষদা, দেবদা 'কাহারা'তে গুরুদেবকে সমাধিস্থ করার অভিমত জানান। কারণ গুরুদেব নাকি তাঁদের সে রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কি, তাঁরা জিতেনদাকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে কাহারাতে পাঠিয়েও দিলেন। আমি এবং লক্ষ্ণৌর সান্যালদা কোন্নগর আশ্রমেই বাবা সমাধিস্থ হবেন বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করি। সান্যালদা বলতে থাকেন যে, বাবার মনের মত করে গড়া নিজস্ব কোন্নগর আশ্রমেই তিনি যেন সমাহিত হ'ন—এই বাসনা গুরুদেব তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। ইতিমধ্যে ভদ্রকালী থেকে আশুতোষদা সর্বপ্রথমে এসে হাজির হলেন। উনিও কোন্নগর আশ্রমের পক্ষে মত দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কোলকাতা থেকে তুষ্টুদা ও অমিয়দা উভয়েই মোটরযোগে সস্ত্রীক উপস্থিত হন। পরেরদিন সকালে 'কাহারা' থেকে জিতেনদা ফেরত এসে গেলেন। তিনি খবর দিলেন যে, সেখানের আশ্রমে পূর্বসূচী অনুযায়ী বিবাহ কার্যাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় চেলাবাবারা সেখানে গুরুদেবের সমাধিকার্যে মত দেয় নাই। সুতরাং গুরুদেবকে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত প্রিয় কোন্নগর আশ্রমে সমাহিত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কোন্নগর আশ্রমের পক্ষে ছিলাম আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ ব্যাপারে অলক্ষ্যে গুরুদেবেরই নির্দেশ যেন কার্যকরী হল।

গুরুদেবকে মোটরগাড়ী যোগে লক্ষ্ণৌ থেকে কোন্নগরে আনার ব্যবস্থাদি দ্রুত সম্পন্ন হতে লাগল। মোটরগাড়ীর আসন তুলে ফেলে সেখানে পাতা হল তৈরী করা কাঠের চেয়ার। তার ওপরে গুরুদেবকে ভালভাবে বসিয়ে চারধারে বেশ সুন্দর ভাবে লবণ ও বরফের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। যাতে বাবার দেহ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। ঐ গাড়ীতে উঠলেন অজুদা আর সুহাষদা। অপর গাড়ীটিতে থাকলেন সস্ত্রীক তুষ্টুদা ও অমিয়দা। গাড়ী দুটো রওনা হল ২৭শে জানুয়ারী মহান্ সাধু-পুরুষের পার্থিব অন্তর্ধানের মুহূর্তের সাক্ষী রইলাম আমরা জনাকয়েক শিষ্য।

সেদিনই সন্ধ্যা ৫ টায় হুগলী থেকে লক্ষ্ণৌ এসে পৌঁছুলেন ঝুপিদিদি, সেজমা, মোহন মান্না আর কোলকাতা ও কোন্নগরবাসী বেশ কয়েকজন শিষ্য। যাঁদের সকলের নাম মনে করতে পারছি না। গুরুদেবের অদর্শনে তথা অন্তর্ধানে সকলেই অতীব বিষাদগ্রস্থ ও শোকমগ্ন হয়ে পড়লেন।

এখানে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। যেটা আমি পরবর্তী সময়ে হুগলীর গুরুভাইবোনদের মুখ থেকে শুনেছিলাম। ২৬ শে জানুয়ারী যেদিন গুরুদেব মরদেহ ত্যাগ করেন সেদিন, হুগলীর জগুদাসপাড়া আশ্রমে পূজাও হোমের সময় চন্দন বৃষ্টি হয়েছিল। এটি গুরুদেবের অপার মহিমার এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন!

* * *

পরদিন ২৭ শে জানুয়ারী সকলে লক্ষ্ণৌ থেকে কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি কেবল সপরিবারে বারাণসীতে যাত্রা বিরতি করলাম।

২৮ শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীবাবার পবিত্র দেহ কোন্নগর আশ্রমে আনিত হয় শেষ দর্শনের জন্য। তাঁর পূত মরদেহ ৩০শে জানুয়ারী সরস্বতী পূজোর দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে আশ্রম প্রাঙ্গণে অগণিত শিষ্য ভক্ত সমাবেশে যথারীতি সমাহিত করা হয়।

*　　*　　*　　*

সম্প্রতি যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আমাদের পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমাধবানন্দগিরি মহারাজজী (মৌনীবাবা) আনুমানিক ২৪৫ বৎসর মানবদেহ ধারণ করে ধর্মজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন এবং অগণিত শিষ্য ভক্তবৃন্দকে তাঁর অমৃতময় উপদেশবাণী বিতরণের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে উত্তরণ করেছেন।

আবির্ভাব :	তিরোভাব :
বাংলা ১১৩৫ সন	বাংলা ১৩৮০
ইং ১৭২৮ খৃঃ	১৯৭৪ খৃঃ

পরমপূজ্য ৺গুরুদেবের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমি রচনাটির সমাপ্তি টানলাম।

জয় গুরু। জয় গুরু॥ জয় গুরু॥

শ্রীদ্বারিকানাথ সাধুখাঁ (নেপালদা)

"গুরু প্রদত্ত মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করা শিষ্যের কর্ম নহে। গুরু যাহা দিয়াছেন, শিষ্য নির্বিচারে তাহাই যপ করিয়া যাইবে।

(শিষ্য যাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহার মনে রাখা উচিৎ যে, তাহার গুরু সর্বজ্ঞ। সর্বদর্শী ও সর্বশক্তিমান ; সুতরাং গুরুর কার্য্যে বা বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া তাঁহার নির্দেশ মত তাহাকে চলিতে হইবে।) গুরু প্রদত্ত মন্ত্রশক্তিই শিষ্যকে চালাইয়া লইয়া যাইবে।"

—শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী।